যক্ষা ৩
গর্ভপাত ৬
বাতজ্বর ৮

স্বাস্থ্য সংলাপ

ICDDR,B CENTRE FOR HEALTH AND POPULATION RESEARCH

আইসিডিডিআর,বি: সেন্টার ফর হেলথ অ্যান্ড পপুলেশন রিসার্চ

বর্ষ ১৪ সংখ্যা ১-২ | শ্রাবণ-অগ্রহায়ণ ১৪১২

নাক থেকে রক্তক্ষরণ: রোগতত্ত্ব ও প্রতিকার

মুহম্মদ শামীম বিন সাঈদ খান, মুহম্মদ হোস্‌নি আমিন

শরীর থেকে রক্ত-পড়া দেখলে আমরা ভয় পেয়ে যাই। আর সেটা যদি কারো নাক দিয়ে পড়ে তাহলে তো কথাই নেই। মাথা গরম হয়েছে ভেবে মাথায় অঝোরে পানি ঢালতে ঢালতে রোগীর সর্দি লাগিয়ে ফেলি। আমাদের অস্থিরতা দেখে রোগী ভয় পেয়ে যায়। এতে রোগীর মধ্যেও শঙ্কা দেখা দেয়। তার স্নায়বিক চাপ (sympathetic over-activity) বৃদ্ধি পেয়ে হৃদযন্ত্রের গতি বেড়ে গিয়ে উচ্চ রক্তচাপ দেখা দেয়। এতে তার নাক দিয়ে রক্তের পরিমাণ আরো বেড়ে যায়, যা রোগীর জন্য খুবই ক্ষতিকর, এমনকী তার জীবনও বিপন্ন হতে পারে। তাই কারো নাকের রক্তক্ষরণ দেখে না-ঘাবড়িয়ে তার প্রতি সহমর্মিতার মনোভাব দেখাতে হবে এবং দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠার ব্যাপারে আশ্বস্ত করতে হবে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

নাক দিয়ে রক্ত-পড়াকে ইংরেজিতে epistaxis বলা হয়। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে খ্রীষ্টপূর্ব পাঁচ শত বছর পূর্বে হিপোক্র্যাটাস নাক দিয়ে রক্ত পড়ার কথা উল্লেখ করেছেন। শুধু তাই নয়, নাকের সামনের অংশে (alae nasi) চাপ দিয়ে ধরে রাখলে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায় তা-ও তিনি সেসময় উল্লেখ করে গিয়েছেন। আলী ইবনে রাবান আল তাবিরি (৮৫০ খৃস্টাব্দ), মরগাগনি (১৭৬৯ খৃস্টাব্দ), মাহমেদ (১৮৮০ খৃস্টাব্দ) এবং আরো অনেকে নাকের রক্তক্ষরণ নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন এবং বিভিন্ন সময়ে অনেক নতুন নতুন তথ্য উপস্থাপন করেছেন।

রোগতত্ত্ব

কোনো বয়সের লোকই নাকের রক্তক্ষরণের ঝুঁকি থেকে মুক্ত নয়–অর্থাৎ যেকোনো বয়সেই এটা হতে পারে। তবে এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে: ১৫ থেকে ২৫ বছর বয়স এবং ৪৫ থেকে ৫৫ বছর বয়সেই নাক থেকে রক্তক্ষরণ বেশি হতে পারে। নাকের সামনের অংশ থেকে শিশু ও অল্প-বয়সীদের রক্তক্ষরণ হয় এবং পিছনের অংশ থেকে বেশি-বয়সীদের রক্তক্ষরণ হয়। নাক থেকে রক্ত-পড়ার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। শীতকালীন শুষ্ক মৌসুমে অথবা প্রচণ্ড গরমে শুষ্ক আবহাওয়াতে নাক থেকে রক্তক্ষরণ হতে পারে। এ-ক্ষেত্রে পাশাপাশি শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণও থাকতে পারে।

নাকের কোথা থেকে রক্তক্ষরণ হয়

আমাদের নাক প্রায় সমান দুইভাগে ভাগ হয়েছে একটি পর্দা দিয়ে যাকে বলা হয় ন্যাজাল সেপ্টাম (nasal septum)। নাকের ভিতর উভয় পাশে সেলফের মত স্তরে স্তরে সজ্জিত রয়েছে তিনটি মাংসপিণ্ডের মতো টারবিনেট (turbinate)। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নিচে যেটি রয়েছে সেটি উপরের দু'টির চেয়ে বড়। নাকের ভিতর রক্তক্ষরণের ক্ষেত্র হিসেবে প্রথম চিহ্নিত করা যায় নাকের সেপ্টামকে। এরপর রয়েছে টারবিনেটসহ অন্যান্য জায়গা। শিরার (venous) রক্তক্ষরণ বেশি দেখা যায় ৩৫ বৎসরের কম-বয়সীদের মধ্যে, আর ধমনীর (arterial) রক্তক্ষরণ ৩৫ বছরের অধিক-বয়সীদের হতে দেখা যায়। এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে: বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে ধমনীর মধ্যস্তরের মাংস (muscle coat) কোলাজেন (collagen) টিস্যু দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়। ফলে রক্তনালীর সংকোচন-ক্ষমতা কমে যায়। এতে রক্তক্ষরণের পরিমাণ বেড়ে যায় ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। অন্যদিকে, শিরার রক্তক্ষরণ শুধু স্বল্প-মেয়াদীই হয় না, ক্ষরণের পরিমাণও কম হয়।

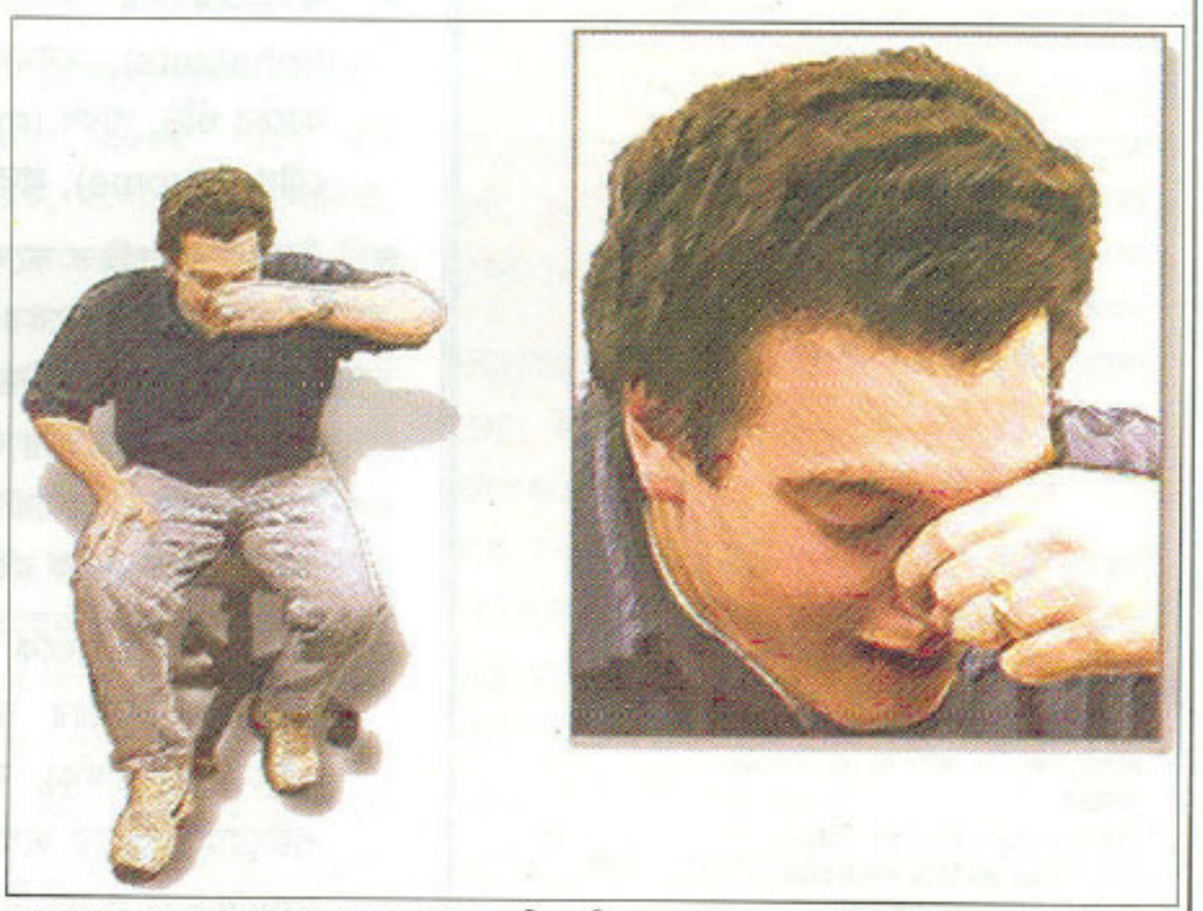

নাক থেকে রক্ত-পড়া শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজে নিজে অথবা অন্য কারো সহায়তায় নাকের ডগা চেপে ধরে দুই ছিদ্রপথ বন্ধ করে রাখতে হবে। এ-অবস্থায় রোগী মুখ দিয়ে শ্বাস নিবে (ছবি: ইন্টারনেট)

ICDDR,B
CENTRE FOR HEALTH AND POPULATION RESEARCH

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি) উন্নয়নশীল বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান। কলেরাসহ ডায়রিয়াজাতীয় রোগের ওপর গবেষণা, এর প্রতিকার ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে পাক-সিয়াটো কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরি নামে ঢাকার মহাখালিতে যে-প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে, মূলত সে-প্রতিষ্ঠানই ১৯৭৮ সালে আন্তর্জাতিকীকরণের মাধ্যমে তার বর্তমান নাম ধারণ করে। এ-প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও সেবাদান-সংক্রান্ত কর্মপরিধি এখন আর কেবল ডায়রিয়াজাতীয় রোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিশু-স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, পুষ্টিবিজ্ঞান, সংক্রামক ব্যাধি ও টিকাবিষয়ক বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনাবিষয়ক কর্মকাঠামোও আইসিডিডিআর,বি'র গবেষণা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ডায়রিয়া রোগীর জীবন রক্ষাকারী খাবার স্যালাইনের আবিষ্কার ও উন্নত মানের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত গবেষণার জন্য আইসিডিডিআর,বি পৃথিবী বিখ্যাত।

স্বাস্থ্য সংলাপ

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক — ডেভিড এ. স্যাক
উপ-প্রধান সম্পাদক — প্রদীপ কুমার বর্ধন
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক — এম. শামসুল ইসলাম খান
সম্পাদক — এম.এ. রহীম

সদস্য
আসেম আনসারী, রুখসানা গাজী,
মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, মোঃ ইকবাল,
মাসুমা আক্তার খানম,
সুমনা লিজা, মোঃ আনিসুর রহমান,
রুবহানা রকিব ও পিটার থর্প

মাস্ট হেড ডিজাইন — আসেম আনসারী
ডেস্কটপ প্রসেসিং ও প্রকাশনা — এম.এ. রহীম

প্রকাশক
আইসিডিডিআর,বি: সেন্টার ফর হেলথ এ্যান্ড পপুলেশন রিসার্চ
মহাখালি, ঢাকা ১২১২ (জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০)
বাংলাদেশ
ফোন: (৮৮০২) ৮৮২ ২৪৬৭, ৮৮১ ১৭৫১-৬০
ফ্যাক্স: (৮৮০২) ৯৮৯ ৯২২৫ ও ৮৮২ ৩১১৬
ইমেইল: msik@icddrb.org

মুদ্রণ: সেবা প্রিন্টিং প্রেস, মহাখালি, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ

কী কী কারণে নাক দিয়ে রক্ত পড়তে পারে

নাক থেকে রক্তক্ষরণের কারণকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়: একটি হলো নাকের ভিতর স্থানীয় (local) কোনো সমস্যা থাকলে এবং অন্যটি হলো শরীরের অন্য কোনো স্থানের (general) অসুস্থতা থাকলে। নাক থেকে রক্তক্ষরণের স্থানীয় (local causes) কারণগুলো নিম্নরূপ:

১. *জন্মগত ত্রুটি (congenital)*

ক. এক পাশ বন্ধ থাকা (choanal atresia)

খ. রক্তনালীর মেনিংগোসিল (meningocele)

গ. এনসেফালোসিল (encephalocele)

২. *প্রতিবেশলব্ধ (acquired) কারণসমূহ*

ক. সংক্রমণ: ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া, ফাংগাস, প্রভৃতির সংক্রমণ হলে

খ. প্রদাহ: এলার্জি অথবা অন্যান্য নাকের প্রদাহ, নাকের পলিপ থাকলে

গ. আঘাতজনিত কারণ (trauma): রোগী নিজেই নাক খোঁচানোর জন্য, মুখমণ্ডলে আঘাত পেলে, নাকে কোনোকিছু প্রবেশ করলে, নাকের অপারেশন হলে

ঘ. টিউমারজনিত কারণ (neoplastic): কম ক্ষতিকর (benign) রক্তনালীর টিউমার (angiofibroman) অথবা ক্ষতিকর (malignant) ক্যান্সার থাকলে

ঙ. ওষুধ গ্রহণজনিত কারণ (drug-induced): রাইনাইটিস মেডিকামেনটোসা দীর্ঘদিন নাকের ওষুধ (ড্রপ) হিসেবে ব্যবহার করলে

চ. শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে রাসায়নিক পদার্থ (inhalants), যেমন হিরোইন, তামাক, কাঠের গুঁড়ি, পারদ (mercury) ও ক্রোমিয়াম যৌগ (chrome), প্রভৃতি গ্রহণ করলে

ছ. শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে দীর্ঘসময় বা দীর্ঘদিন অবস্থান করলে নাকের ভিতরটা শুকিয়ে যায়। এতে নাকের পানিজাতীয় পদার্থ শুকিয়ে আঠালো ও শক্ত হয়ে আসে। সেই শক্ত পদার্থ আঙুল দিয়ে সরানোর সময় ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এই ক্ষতস্থান থেকে রক্তক্ষরণ হয়ে থাকে

জ. সমুদ্র সমতল থেকে অনেক উপরে উঠলে শরীরের ভিতরের রক্তচাপ এবং বাইরের বায়ুচাপের পার্থক্য সৃষ্টি হয়। এ-ক্ষেত্রে শরীরের ভিতরের চাপ তুলনামূলকভাবে বেশি হওয়ায় নাক ও মুখ দিয়ে রক্তক্ষরণ হতে পারে

ঝ. ভিকারিয়াস মাসিকের (vicarious menstruation) কারণে নাক দিয়ে রক্ত পড়তে পারে। এটা এক অদ্ভুত ব্যাপার। জরায়ুর সবচেয়ে ভিতরের টিস্যু যদি কখনও নাকের ভিতর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় (ectopic rest of endometrium) সেক্ষেত্রে প্রতিবার মাসিকের সময় নাক দিয়ে রক্ত পড়তে পারে। বয়োঃসন্ধিক্ষণে এধরনের রক্তক্ষরণ ভীতি সৃষ্টি করে।

নিচে বর্ণিত অন্যান্য শারীরিক কারণেও (general/systemic causes) নাক দিয়ে রক্ত পড়তে পারে:

রক্তের জমাট বাঁধার জন্য যেসব জিনিস প্রয়োজন (coagulation factors) সেগুলোর এক বা একাধিকটির অভাব থাকলে বা ত্রুটিপূর্ণ হলে রক্তক্ষরণ হয়ে থাকে। এর মধ্যে আছে হিমোফিলিয়া, ক্রিস্টমাস ডিজিজ (christmas disease), প্রভৃতি। ধমনী ও শিরার গঠনগত ত্রুটি থাকার জন্যও নাক দিয়ে রক্ত পড়তে পারে। ভিটামিন কে, ভিটামিন সি-এর অভাবে অথবা যকৃতের অসুস্থতার কারণে নাকের ভিতরসহ শরীরের অন্যান্য যেকোনো ক্ষতস্থানে রক্তক্ষরণ দেখা দিতে পারে। এছাড়া রক্তের ক্যান্সার অর্থাৎ লিউকোমিয়া হলেও নাকের রক্তক্ষরণ হতে পারে।

কিছু ওষুধ রয়েছে যেগুলো ব্যবহারের ফলে নাক দিয়ে রক্ত পড়তে পারে। সেগুলো হলো: ব্যথানাশক হিসেবে বহুলব্যবহৃত অ্যাসপিরিন, রক্তের জমাট-বাঁধার প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী স্ট্রেপটোকাইনেস ও হেপারিন, স্টেরয়েড, অ্যালকোহল, প্রভৃতি।

কিছু রোগের কারণে নাক দিয়ে রক্ত পড়তে পারে। সেগুলো হলো: যকৃতের অকার্যকারিতা (hepatic failure) থাইরয়েড-গ্রন্থির কম কার্যকারিতা (hypothyroidism), এইডস, যক্ষা, কুষ্ঠরোগ, প্রভৃতি।

নাক থেকে রক্তক্ষরণের অনেক কারণ উপরে উল্লেখ করা হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এ-অবস্থাকে idiopathic /spontaneous বা স্বতঃস্ফূর্ত রক্তক্ষরণ বলে সনাক্ত করা হয়। কারণ যাই হোক না কেন, যখনই কারো নাক দিয়ে রক্ত পড়বে তখনই তা দ্রুত বন্ধ করার ব্যবস্থা নিতে হবে। চিকিৎসা শুরু করতে বিলম্ব অথবা রক্তপড়া বন্ধ করতে না-পারলে রোগীর জন্য বিরাট ক্ষতি হতে পারে, এমনকী মৃত্যুও হতে পারে।

নাক দিয়ে রক্তক্ষরণ হলে কী করবেন

কী কারণে নাক থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে তা অতি অল্পসময়ে খুঁজে বের করতে হবে। তবে যেহেতু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কারণ অজানা থেকে যায়, নিচে বর্ণিত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে দ্রুত রক্তক্ষরণ বন্ধ করা সম্ভব:

১. নাকের সামনের অংশ চাপ দিয়ে ধরে রাখতে হবে। রোগীকে বসিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে থাকতে বলতে হবে (forward bending)। রোগীর নাক বন্ধ থাকায় তাকে মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে হবে। নাকে চাপ দিয়ে ৮ থেকে ১০ মিনিট ধরে রাখলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়। সেই সাথে নাকের মাঝামাঝি উপরের দিকে (nasal bridge) এবং মুখের তালুতে (hard palate) ঠাণ্ডা বা বরফের ছ্যাক দিতে হবে।

২. উপরের পদ্ধতিতে রক্তক্ষরণ বন্ধ না-হলে নাকের ভিতর এন্টিবায়োটিক-মেশানো প্যাক (anterior nasal packing) দিতে হবে। প্যাক ঠিকমত দেওয়া হলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়।

৩. রোগীর উচ্চ রক্তচাপ থাকলে তা কমাতে হবে। রোগীর দুশ্চিন্তা বেশি হলে তা কমাতে হবে।

৪. ভিটামিন কে এবং ভিটামিন সি-এর অভাবজনিত কারণে রক্তক্ষরণ হলে এগুলো পরিমাণ মত খাওয়াতে হবে।

৫. রক্তক্ষরণের কারণে নাকের ভিতর সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে বিধায় এন্টিবায়োটিক দিতে হয়।

উপসংহার

যুগ যুগ ধরে মানুষের নাক দিয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে রক্ত-পড়া বন্ধ হয়েছে এবং রোগী দ্রুত সুস্থ হয়েছে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে নাকের রক্তক্ষরণ শুধু সাধারণ চিকিৎকদের সমস্যায় ফেলে নি, এমনকী নাক-কান ও গলা বিশেষজ্ঞদেরও ভাবিয়ে তুলেছে। নাকের রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্য বড় বড় রক্তনালী, এমনকী গলার ক্যারোটিড ধমনী (external carotid artery) অপারেশনের মাধ্যমে বাঁধার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। তাই নাক থেকে রক্তক্ষরণকে অবহেলা করলে রোগীর জীবনও বিপন্ন হতে পারে। প্রয়োজনে নাক-কান ও গলা বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হয়ে সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে হবে।

বার্ড ফ্লু বা অ্যাভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা

মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, সুলতানা মনিরা হোসেন
এ আর এম সাইফুদ্দীন একরাম

বার্ড ফ্লু বা অ্যাভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা একধরনের ভাইরাসজাতীয় রোগ যা অ্যাভিয়ান (পাখি) ইনফ্লুয়েঞ্জা (ফ্লু) ভাইরাসের কারণে হয়ে থাকে। এই ভাইরাস সাধারণত পাখিদের মধ্যে বেশি সংক্রামিত হয়। বন্যপ্রাণী অথবা মৌসুমী (migratory) পাখি এই ভাইরাস এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় নিয়ে যেতে পারে এবং গৃহপালিত (domesticated) ও ফার্মের পাখি, যেমন হাঁস-মুরগি, টারকি (তিতির), ইত্যাদি আক্রান্ত হয় এবং তাদের মধ্যে এ-রোগ ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে।

১৯১৮-১৯১৯ সালে পৃথিবী জুড়ে ইনফ্লুয়েঞ্জা A (HINI) ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে ভারতবর্ষে আনুমানিক ৯০ লক্ষ লোক মারা যায় এবং সারা বিশ্বে আনুমানিক ৪ কোটি লোক মারা যায়। ১৯৫৭-১৯৫৮ সালে পৃথিবীতে ইনফ্লুয়েঞ্জা A (H2N2) ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে আনুমানিক ২০ লক্ষ লোক মারা যায় এবং ১৯৬৮-১৯৬৯ সালে এই ভাইরাসের (H3N3) প্রাদুর্ভাবে ৭ লক্ষ ৫০ হাজারের মত লোক মারা যায়।

১৯৯৬ সালে একটি নতুন প্রকারের বার্ড ফ্লু ভাইরাস (H5N1) পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে বিস্তার লাভ করে। এশিয়ার নয়টি দেশে হাঁস-মুরগির খামারে অ্যাভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা (H5N1) রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। দেশগুলি হলো কম্বোডিয়া, চীন, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড এবং লাওস। ২০০৫ সালে এই ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব তুরস্ক, মঙ্গোলিয়া, রোমানিয়া, রাশিয়া এবং কাজাখিস্তানেও দেখা দিয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে ২০০৪ সালের জানুয়ারি থেকে ২০০৫ সালের ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৩৭ জন মানুষ এই ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে বলে ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে এবং তাদের মধ্যে ৭০ জন মারা গেছে। এই ভাইরাস তার গঠনগত পরিবর্তনের মাধ্যমে মারাত্মক রকমের জীবন-নাশক ভাইরাসে রূপান্তরিত হতে পারে এবং সারা বিশ্বে এ-রোগ ছড়িয়ে পড়লে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হতে পারে। তাই জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বার্ড ফ্লু-কে পৃথিবীর জন্য একটি বিশেষ জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং পোলট্রি ফার্ম থেকে এ-রোগ নির্মূল করার জন্য এবং মানুষের মধ্যে এর বিস্তার প্রতিরোধের জন্য তাঁরা পৃথিবীজোড়া কার্যক্রম নিতে যাচ্ছে।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের প্রকারভেদ ও বৈশিষ্ট্য

ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসকে A, B এবং C এই তিন প্রকারে ভাগ করা হয়েছে। ইনফ্লুয়েঞ্জা B এবং C ভাইরাস শুধুমাত্র মানুষকে আক্রান্ত করে। ইনফ্লুয়েঞ্জা A ভাইরাস মানুষ এবং অন্য প্রাণীকেও আক্রান্ত করে। মৌসুমী পাখি, গৃহপালিত পাখি, ঘোড়া ও শুকর এ-ভাইরাসের শিকার হতে পারে। A ভাইরাস ১৬ ধরনের হিমাগ্লোটিনিন H (haemaglutinin) এবং ৯ ধরনের নিউরোমাইনিডেজ N (neurominidase) প্রোটিন দিয়ে গঠিত। এসব প্রোটিনের বিন্যাসের মাধ্যমে এরা সম্পূর্ণ নতুন প্রজাতির ভাইরাস গঠন করে।

A গোত্রভুক্ত যেসব ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস মানুষের মধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ সৃষ্টি করে এরা সকলেই জিনগতভাবে পরিবর্তনশীল এবং খুব সহজেই পরিবর্তিত অবস্থার সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং সহজেই মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বিপন্ন করতে পারে। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের বংশবৃদ্ধির সময় জিনে যদি কোনো ত্রুটিপূর্ণ বিভাজন হয় তবে ভাইরাস তা সনাক্ত ক'রে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে পারে না। ফলে ভাইরাসে জিনের গঠন পরিবর্তিত হয়। এই নতুন প্রজাতিতে নতুন ধরনের অ্যান্টিজেনও তৈরি হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস অ্যান্টিজেনের এই প্রতিনিয়ত, স্থায়ী ও অল্পমাত্রার পরিবর্তনকে অ্যান্টিজেনের ড্রিফট (drift) বলা হয়।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের দ্বিতীয় আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো: ইনফ্লুয়েঞ্জা A ভাইরাস এবং এর বিভিন্ন টাইপগুলো নিজেদের জিনগত উপাদান পরিবর্তন করে নতুন আঙ্গিকে আবির্ভূত হতে পারে। এই পদ্ধতিকে অ্যান্টিজেনের শিফট (shift) বলা হয়। এতে মাতৃ-প্রজাতি থেকে ভিন্ন রকমের নতুন উপ-প্রজাতির ভাইরাস সৃষ্টি হয়। শিফটের ফলে যে-ভাইরাসটির সৃষ্টি হয় তা প্রচলিত টিকার মাধ্যমে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় না। যেহেতু মানুষের দেহে এই নতুন উপ-প্রজাতির ভাইরাসের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধ-ক্ষমতা গড়ে ওঠে নি এবং এর বিরুদ্ধে

প্রতিরোধী কোনো উপযুক্ত টিকাও নেই, তাই এধরনের অ্যান্টিজেনের শিফটের ফলে ভয়াবহ মহামারী সৃষ্টি হয়।

ইনফ্লুয়েঞ্জা A ভাইরাসের ক্রমাগত গঠনগত পরিবর্তন হওয়ার প্রবণতা বেশি এবং পরিবর্তনের মাধ্যমে মারাত্মক সংক্রমণশীল ভাইরাস আবির্ভূত হয় এবং মানুষকে আক্রান্ত করে। এই ভাইরাস কখনো কখনো মানুষ থেকে মানুষে ছড়াতে পারে। শুধুমাত্র ইনফ্লুয়েঞ্জা A ভাইরাস এক দেশ থেকে অন্য দেশে ছড়িয়ে পৃথিবী জুড়ে ভয়াবহ আকারে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

পশু-পাখি থেকে মানুষের মধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জা A ভাইরাসের বিস্তার

ইনফ্লুয়েঞ্জা A ভাইরাস-আক্রান্ত পাখির সংস্পর্শে এসে অথবা আক্রান্ত পাখির নিঃসৃত পদার্থ (পায়খানা, লালা) থেকে, খামারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, খাঁচা ও খাদ্যের পাত্র অথবা অন্যান্য দ্রব্যাদি থেকেও মানুষ আক্রান্ত হতে পারে। অনেক বাড়িতেই হাঁস-মুরগি পালন করা হয়। এসব হাঁস-মুরগি বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘোরাফেরা করে এবং স্বাভাবিকভাবে মানুষের সংস্পর্শে আসে। যেহেতু আক্রান্ত পাখি পায়খানার মাধ্যমে অনেক ভাইরাস নিঃসরণ করে, সুতরাং এরকম পরিবেশে সংক্রমণের সম্ভাবনা অনেকাংশে বেড়ে যায়। তাছাড়া, এশিয়ার দেশসমূহে অনেক পরিবারে অসুস্থ হাঁস-মুরগি খাওয়ার জন্য জবাই করা হয়। অসুস্থ হাঁস-মুরগি জবাই করা, পশম ছাড়ানো এবং রান্নার জন্য প্রস্তুতির সময়ও আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক হারে বেড়ে যায়। কখনো কখনো এ-ভাইরাস মানুষ থেকে মানুষে হাঁচি-কাশির মাধ্যমেও ছড়াতে পারে। নিজে এই ভাইরাসে অসুস্থ হওয়ার আগেও যেকেউ তা ছড়ানোর ক্ষমতা রাখে এবং অন্য দেশে ভ্রমণকালে সংক্রামিত ব্যক্তি ভাইরাসটি অন্য দেশে ছড়াতে পারে। আগের মহামারী থেকে দেখা গেছে: এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়লে ২৫ থেকে ৩০ ভাগ লোক আক্রান্ত হতে পারে। ১৯৫৭ সালের মহামারী থেকে ধারণা করা হয়: এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়লে এখন ২০ লক্ষ থেকে ১৫০ লক্ষ লোক মারা যাবে।

সংক্রমণ এড়ানোর জন্য আক্রান্ত পাখি খামার থেকে সরানোর সময় রেসপিরেটর মাস্ক বা মুখোশ পরে নিতে হবে (ছবি: ইন্টারনেট)

ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের বিস্তার

বন্যপাখি (wild birds)/যাযাবর পাখি, বিশেষ করে বুনোহাঁস এই ভাইরাসের প্রাকৃতিক ধারক এবং এরা বেশিমাত্রায় রোগ-প্রতিরোধী। অন্যদিকে গৃহপালিত হাঁস-মুরগি এবং টারকি (তিতির) এ-রোগে খুব দ্রুত আক্রান্ত হয় ও মারা যায়। এসব গৃহপালিত পাখি যাযাবর পাখির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংস্পর্শে এসে এ-রোগে আক্রান্ত হয়।

আক্রান্ত পাখি সাধারণত লালা এবং পায়খানার মাধ্যমে এ-ভাইরাস নিঃসরণ করে। মহামারী সৃষ্টিকারী ইনফ্লুয়েঞ্জা A ভাইরাসের টাইপ খুবই সংক্রামক এবং এরা খামারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, যানবাহন, খাদ্যের পাত্র, খাঁচা, ইত্যাদি দ্বারা বাহিত হয়।

পাখিদের রোগের লক্ষণ/উপসর্গসমূহ

বলা হয়েছে হাঁস-মুরগির মধ্যে এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। বন্যপাখি স্বাভাবিকভাবে অসুস্থ না-হয়েও এই ভাইরাস বহন করতে পারে। জীবাণু-সংক্রমণের পর পাখিদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের লক্ষণ দেখা দেয়। এতে কোনো কোনো প্রাণী অল্পমাত্রায় অসুস্থ হয়। তবে অল্প সময়েই এ-রোগটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং রোগাক্রান্ত পাখির মৃত্যুর হার বেড়ে যায় ও রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। রোগটি দ্রুত ছড়িয়ে প'ড়ে পাখির মৃত্যুর হার বেড়ে যাওয়ার এ-অবস্থাকে উচ্চ সংক্রমণশীল অ্যাভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা বলে। এতে পাখি হঠাৎ করে অসুস্থ হয় এবং ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ৯০-১০০ ভাগ পাখি মারা যায়।

মানুষের মধ্যে রোগের উপসর্গ

ভাইরাস-আক্রান্ত হওয়ার পর ১ থেকে ৭ দিনের মধ্যে মানুষের ক্ষেত্রে উপসর্গ দেখা দিতে পারে। প্রধানত জ্বর, কাশি, গলাব্যথা, মাংসপেশীতে ব্যথা থেকে চোখ লাল-হওয়া, নিউমোনিয়া, প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট (acute respiratoy distress), ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়।

চিকিৎসা

কিছু কিছু অ্যান্টি-ভাইরাল ওষুধ, যেমন Tamiflu ও Relenza বাজারে এসেছে, যা অসুখের ভয়াবহতা (severity) এবং অসুস্থতার স্থায়িত্ব (duration of illness) কমাতে পারে।

প্রতিষেধক/ভ্যাকসিন

এ-ভাইরাসের জন্য কার্যকর কোনো ভ্যাকসিন বাজারে নেই কিন্তু বিভিন্ন দেশে প্রস্তুতির পর্যায়ে রয়েছে। তাছাড়া, ভাইরাস ক্রমাগত পরিবর্তনশীল হওয়ায় কার্যকর ভ্যাকসিন তৈরি করাও কঠিন।

বাংলাদেশে বার্ড ফ্লু'র আশঙ্কা ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা

বাংলাদেশে এখনো বার্ড ফ্লু রোগের সংক্রমণ ঘটে নি, কিন্তু এ-দেশে এ-রোগের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যদিও বাংলাদেশ সরকার বার্ড ফ্লু-আক্রান্ত দেশ থেকে মুরগি ও মুরগির বাচ্চা আমদানি নিষিদ্ধ করেছে, তবুও অতিথি পাখির আগমনে অথবা অন্য কোনো উপায়ে এই ভাইরাস বাংলাদেশে আসতে পারে। তাই এই ভাইরাস প্রতিরোধের জন্য কিছু জরুরি ব্যবস্থা ও সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। এগুলো হলো:

- বাংলাদেশ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, গবেষণা কেন্দ্রসমূহ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ বার্ড ফ্লু'র জরিপকর্মে ও নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত পদ্ধতিতে কাজ করতে পারে
- বাংলাদেশে হাঁস-মুরগির খামার নিরূপণ ও এগুলোকে জরিপের আওতায় আনতে হবে
- অতিথি পাখিদের পর্যবেক্ষণের আওতায় আনতে হবে
- মানুষের ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের অস্বাভাবিক প্রকোপ নির্ণয় করতে অন্যান্য সংক্রামক রোগের ন্যায় জরিপের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে
- হাঁস-মুরগির খামারের সাথে সংশ্লিষ্ট লোকদের এ-রোগ সম্পর্কে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন, যাতে তারা হাঁস মুরগির মধ্যে অস্বাভাবিক মড়ক/অসুস্থতা দেখা দিলে নিকটস্থ পশু-চিকিৎসা কেন্দ্রে যোগাযোগ করে এবং রোগ প্রতিরাধের ব্যবস্থা নিতে পারে
- ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ সম্পর্কে জনগণ ও স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে
- রোগ নির্ণয়ের ব্যবস্থা, যেমন দক্ষ লোকবল তৈরির জন্য প্রশিক্ষণ, রোগ নির্ণয়ের যন্ত্রপাতি ও পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশেষ পরীক্ষাগারের ব্যবস্থা করতে হবে
- বার্ড ফ্লু-আক্রান্ত দেশ থেকে মুরগি ও মুরগির বাচ্চা আমদানি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে
- অতিথি পাখি ধরা, মারা ও বিক্রয় করা কার্যকরভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে।

রোগ প্রতিরোধে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলো বিষয়েও সচেতন থাকতে হবে:

- পাখির প্রতিপালক ও পাখি-ব্যবসায়ীদের রোগের মহামারীর সময় অভেদ্য কাপড় দিয়ে শরীর ঢেকে রাখতে হবে। হাতে রবারের ভারী দস্তানা পড়তে হবে, এন৯৫ মাপের রেসপিরেটর মাস্ক, চশমা (goggles) এবং রাবার বা পলি ইউরেথেন দিয়ে তৈরি জুতা পরা উচিত।
- আক্রান্ত পাখির সংস্পর্শে এসেছে এমন লোকের ভালো করে সাবান দিয় হাত ধোয়া উচিত। পাখির প্রতিপালক ও বাহকদের কাজ সম্পন্ন করার পর জীবাণু-নাশক দিয়ে নিজেদের পরিষ্কার করা শ্রেয়।
- পাখিকে জবাই করার জায়গাও বিভিন্ন প্রতিরোধী ব্যবস্থায় জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে।
- যেসব মানুষ আক্রান্ত পাখি (হাঁস-মুরগি) বা খামারের সংস্পর্শে আসবে তাদের মধ্যে রোগলক্ষণ দেখা দিচ্ছে কি না সে-ব্যাপারে স্বাস্থ্যকর্মীদের বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে।
- যারা পশু-চিকিৎসক অথবা পাখি পালন করে তাদের রক্ত মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখা উচিত এবং এদেরকে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস-বিরোধী টিকা দেওয়া উচিত।
- নির্দিষ্ট গবেষণাগারে আক্রান্ত প্রাণীর (শুকরসহ) রক্ত ও মৃত্যু পরবর্তী পাকস্থলি এবং অন্ত্রের কিছু অংশ, পায়ু ও মুখ-নাসারন্ধ্রের শ্লেষ্মা (Swab), শ্বাসনালী, ফুসফুস, প্লীহা, বৃক্ক, মস্তিষ্ক, যকৃত ও হৃদপিণ্ডের নমুনা সংরক্ষণ করে নতুন ভাইরাসের আবির্ভাব সনাক্তকরণের পরীক্ষা করা উচিত।
- অসুস্থ হাঁস-মুরগি খাওয়ার অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হবে।
- মুরগি বা হাঁসের মাংস খুব ভালোভাবে রান্না করে খেতে হবে এবং রান্নার সময় যাতে মাংসের ঝোল ভালো করে ফোটে সে-ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন।

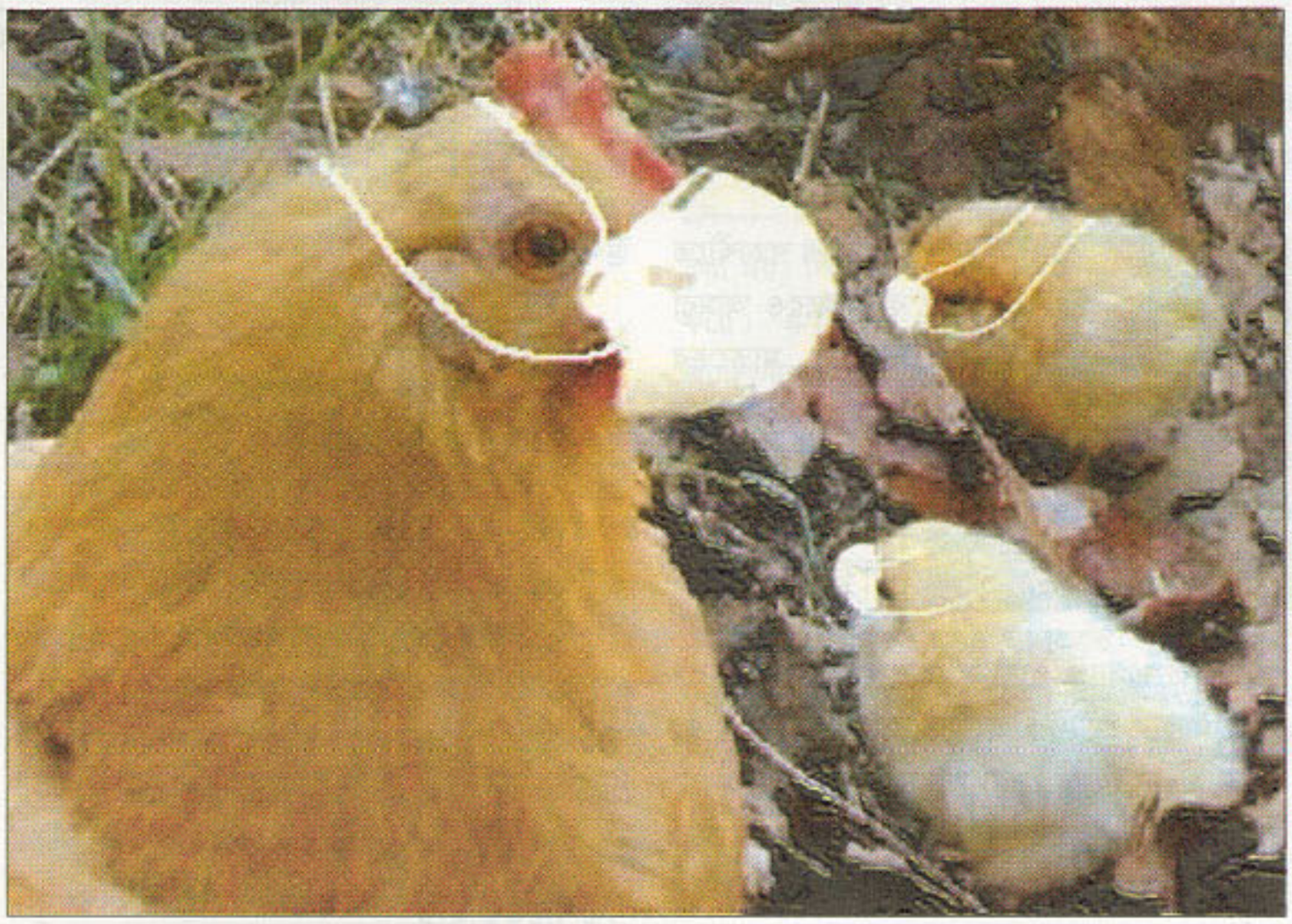

অনেক ক্ষেত্রে আক্রান্ত পাখিদেরও রেসপিরেটর মাস্ক বা মুখোশ পরালে বার্ড ফ্লু ভাইরাসের বিস্তার রোধ করা সহজতর হয়। এ-ক্ষেত্রে পাখি থেকে পাখিতে সংক্রমণ যেমন কমে যায়, তেমনি পাখি থেকে মানুষে সংক্রমণের মাত্রাও কমে যায় (ছবি: ইন্টারনেট)

উপসংহার

বাংলাদেশে যদিও এখনও পর্যন্ত বার্ড ফ্লু সংক্রমণের কোনো খবর পাওয়া যায় নি, তবুও অদূর ভবিষ্যতে এর সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এইডস মহামারী থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমরা যেমন সাবধানতা অবলম্বন করেছি, তেমনি সম্ভাব্য বার্ড ফ্লু মহামারীর কবল থেকে বাঁচার জন্যও আমাদের সদা সতর্ক থাকতে হবে, কারণ এ-দেশে হাঁস-মুরগির খামারের দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটছে। বাংলাদেশ সরকার বার্ড ফ্লু-আক্রান্ত দেশ থেকে গৃহপালিত পাখি আমদানী নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এর সঙ্গে সেসব দেশ থেকে খামার-সামগ্রী আমদানীও নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন। বার্ড ফ্লু প্রতিরোধ করা সকলের দায়িত্ব এবং এজন্য সরকার, এনজিও, জনগণ, খামার মালিক, ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে একসাথে কাজ করতে হবে, যাতে সহজে এই রোগ নির্ণয় ও প্রতিরোধ করা যায়।

আইসিডিডিআর,বি থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক 'জার্নাল অফ হেলথ, পপুলেশন অ্যান্ড নিউট্রিশন' এর গ্রাহকগণকে ২০০৬ সালের জন্য তাঁদের সাবস্ক্রিপশন নবায়ন করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে

গর্ভপাত: প্রকারভেদ ও ব্যবস্থাপনা

মোছাঃ আরিফা শারমিন, রুখসানা গাজী

একবিংশ শতাব্দীতে বাস করেও আমরা নিরাপদ মাতৃত্বের কথা সগৌরবে বলতে পারি না। চিরন্তন নিয়মানুযায়ী মানবজাতিকে যারা ধারণ করে আসছে সেই নারী এখনও পায় না তার যোগ্য অধিকার। বেঁচে থাকার মৌলিক প্রয়োজনের মধ্যে স্বাস্থ্য যে একটা প্রধান বিষয় সেটা সাধারণ নারীদের অবস্থা দেখে বোঝার উপায় নাই। বাংলাদেশে মাতৃত্বের পূর্ণতাপ্রাপ্তির পথে প্রধান অন্তরায়গুলোর একটি হচ্ছে গর্ভপাত।

গর্ভপাত বলতে আমরা কী বুঝি? গর্ভধারণের পর থেকে তা পূর্ণতাপ্রাপ্তি অর্থাৎ মায়ের জরায়ু থেকে বের হয়ে বাইরের পৃথিবীতে বেঁচে থাকার ক্ষমতা অর্জনের পুর্বেই যদি ভ্রুণ/বাচ্চা নষ্ট হয়ে যায় তবে তাকে গর্ভপাত (abortion) বলা হয়। ভ্রুণের এই পূর্ণতাপ্রাপ্তির বয়স (viable age) হচ্ছে আটাশ সপ্তাহ। গর্ভপাতকে প্রকারভেদে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়:

ক. অনিচ্ছাকৃত/প্রকৃতির নিয়মে/আপনা-আপনি গর্ভপাত (spontaneous abortion)

খ. ইচ্ছাকৃত গর্ভপাত (induced abortion)

ক. অনিচ্ছাকৃত গর্ভপাতকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায় এবং এই ভাগগুলো ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা-সাপেক্ষে করা হয়ে থাকে, যেমন ১. শারীরিক হুমকিজনিত গর্ভপাত (threatened abortion), ২. ইনএভিটেবল/অবশ্যই ঘটবে (inevitable abortion) এমন গর্ভপাত, ৩. সম্পূর্ণ গর্ভপাত (complete abortion), ৪. অসম্পূর্ণ গর্ভপাত (incomplete abortion), ৫. লুক্কায়িত গর্ভপাত (missed abortion) এবং ৬. সংক্রামিত গর্ভপাত (infectious or septic abortion)

খ. ইচ্ছাকৃত গর্ভপাতকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়:

১. বৈধ (legal) গর্ভপাত

২. অবৈধ (illegal/criminal) গর্ভপাত

উপসর্গ

১. সাধারণত ২/৩ মাস মাসিক বন্ধ থাকবে; ৬ মাস পর্যন্ত বন্ধ থাকতে পারে

২. হঠাৎ করে তলপেটে প্রচণ্ড ব্যথা হবে

৩. ব্যথার পরপরই যোনিদ্বার দিয়ে তরল বা চাকা-চাকা তাজা রক্ত যাওয়া শুরু হবে

৪. অনেক সময় প্রচণ্ড জ্বরও আসে

৫. বমি হতে পারে, দুর্গন্ধযুক্ত রক্তস্রাব হয় এবং রোগী জ্ঞান হারাতে পারে

৫ নং উপসর্গ সাধারণত septic abortion-এর ক্ষেত্রে দেখা যায়।

গর্ভপাতের হার

বাংলাদেশে গর্ভপাতের হার প্রায় ১১% এবং এর মধ্যে ৭৫% গর্ভপাত ঘটে গর্ভধারণের ১৬ সপ্তাহ বা ৪ মাসের মধ্যে। আবার এর ৭৫% ঘটে ৮ সপ্তাহ বা ২ মাসের আগেই।

গর্ভপাতের কারণ

যদিও সামগ্রিকভাবে বলা হয়ে থাকে: দেশে শিক্ষার মান বেড়েছে, তবুও নানা ধরনের কুসংস্কার এখনও মানুষের মন থেকে দূর হয় নি। বিশেষ করে যারা গ্রামে বাস করেন, তারা অনেকেই আজও মনে করেন, জ্বীন বা ভুতের আছর গর্ভবতী মায়ের উপর পড়লে বাচ্চা নষ্ট হয়ে যায়। কত মেয়ের সংসার পর্যন্ত ভেঙে গেছে এই ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে। গ্রামের কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকজন বিশ্বাস করে: সন্ধ্যায় বাঁশঝাড়ের নিচ দিয়ে যাওয়া বা তেলের তৈরি খাবার খেতে-খেতে হাঁটা গর্ভবতী মায়েদের জন্য বিরাট অন্যায়, কারণ এসবে নাকি জ্বীন/ভূত বেশি আকৃষ্ট হয়। অশিক্ষা আর কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে সত্যিকারের কারণগুলো অগোচরেই থেকে গেছে।

গর্ভপাতের প্রধান কারণসমুহকে নিম্নোক্ত দুইভাগে ভাগ করা যায়:

১. **বাচ্চার সাথে সম্পর্কযুক্ত কারণ (Foetal cause)**

ক. ভ্রুণঘটিত সমস্যা (ovo-foetal factor)--বংশগতির বাহক বা জিনের সমস্যা, শারীরিক কাঠামোতে (physical structure) অসঙ্গতি

খ. বাচ্চা ও মায়ের সাথে সংযুক্ত নালীর (umbilical cord) মধ্যে রক্ত চলাচলে সমস্যা

গ. গর্ভফুল বা placenta জরায়ুর মুখে বা নিচে থাকা (low lying placenta)

ঘ. গর্ভফুলের অস্বাভাবিক গঠন (circumvallate/battledor placenta)

ঙ. পেটে অর্থাৎ জরায়ুর মধ্যে বাচ্চা যে থলিতে থাকে (amniotic sac) তাতে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পানি থাকা, যাকে পলিহাইড্রামনিওস (polyhydramnios) বলা হয়।

চ. ত্রুটিপূর্ণ জমজ বাচ্চা

২. **মায়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত কারণ (related to mother/maternal cause)**: দেরিতে যেসমস্ত গর্ভপাত হয় সাধারণত সেসব ক্ষেত্রে কারণগুলো মায়ের অবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে বসবাস, অপুষ্টি, কিছু বদ-অভ্যাস, অনুন্নত আর্থ-সামাজিক অবস্থা, অশিক্ষা–এসব কারণের জন্য গর্ভপাত হতে পারে।

ক. *মায়ের অসুস্থতা*

১. গর্ভকালীন সময়ে মা যদি রুবেলা (rubella virus)/জার্মান হাম, হেপাটাইটিস, ইনফ্লুয়েঞ্জা, পারভো ভাইরাসে আক্রান্ত হয় তাহলে গর্ভপাত হতে পারে। ম্যালেরিয়া/ব্রুসেনোসিস বা টক্সোপ্লাজমোসিস (toxoplasmosis) রোগে আক্রান্ত হলেও গর্ভপাত ঘটতে পারে।

২. মায়ের যদি হৃদপিণ্ডের অসুখ, দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসকষ্ট বা অতিরিক্ত রক্তশূন্যতা থাকে, এমনকী মারাত্মক ডায়রিয়া হলেও গর্ভপাত হতে পারে।

৩. কারো যদি উচ্চ রক্তচাপ, কিডনীতে প্রদাহ থাকে তাহলে গর্ভফুল শুকিয়ে যায় এবং বাচ্চা ঠিকমত অক্সিজেন না পাওয়ার কারণে গর্ভপাত ঘটে।

৪. কেউ যদি গলগণ্ড, ডায়াবেটিস রোগে ভোগেন তার ক্ষেত্রেও গর্ভপাতের সম্ভাবনা থাকে।

খ. আঘাতজনিত কারণ

- এখনও আমাদের দেশের স্বামীরা নানা কারণে তাদের স্ত্রীদের অত্যাচার করে। গর্ভকালীন সময়েও তারা এই নিষ্ঠুরতা থেকে রক্ষা পায় না। গর্ভবতী মহিলা তলপেটে আঘাত পেলে অথবা পা পিছলে পড়ে গেলেও গর্ভপাত হতে পারে।
- অমসৃণ রাস্তায় রিকশা/বাসে ভ্রমণ করলেও গর্ভপাত হতে পারে।
- অনেক সময় পেটে পানি বেশি থাকলে তা বের করার সময়ও গর্ভপাত হতে পারে, যাকে অ্যামনিওসেনটেসিস/amniocentesis বলা হয়।

গ. আর্সেনিক, লেড, ধূমপান, কফি ও মদ বেশি খেলে গর্ভপাত হতে পারে

ঘ. জরায়ুঘটিত কারণ

১. প্রসব বেদনার আগ-পর্যন্ত জরায়ুর মুখ যদি বন্ধ না থাকে (carvical incompetence)

২. জরায়ুর গঠনে জন্মগত ত্রুটি (bicornuate uterus) কিংবা সেপটেট জরায়ু (septate uterus) থাকলে

৩. জরায়ুতে টিউমার-থাকা

ঙ. *রক্তের গ্রুপের অসামঞ্জস্যতা (blood group incompatibility)*: স্বামীর রক্তের গ্রুপ 'A' এবং স্ত্রীর রক্তের গ্রুপ 'O' হলে, এমনকী একই গ্রুপের মধ্যে পজিটিভ-নেগেটিভ অসামঞ্জস্যতা থাকলেও অনেক সময় গর্ভপাত ঘটে থাকে

চ. *জরায়ুর থলির ছিন্ন পর্দা*: জরায়ুর যে থলিতে বাচ্চা থাকে তার পর্দা সময়ের আগে ছিদ্র হলে (premature rupture of membrane), যাকে সংক্ষেপে PROM বলা হয়।

ছ. *ভিটামিনের অভাব*: গর্ভকালীন সময়ে ভিটামিন, বিশেষ করে ফলিক এসিড (folic acid), ভিটামিন ই এবং ভিটামিন বি১২-এর অভাব থাকলে

উপরোক্ত কারণগুলোর জন্য প্রথম তিন মাসে বা ১২ সপ্তাহেই গর্ভপাত বেশি ঘটে এবং এর জন্য প্রধানত যে সমস্যাগুলো দায়ী তার মধ্যে ৪টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো হলো:

১. ভ্রূণঘটিত সমস্যা (malformation of zygote)
২. ট্রাইসোমি (trisomy)
৩. আঘাতজনিত সমস্যা (trauma)
৪. সংক্রমণজনিত সমস্যা (infection)

শারীরিক হুমকিজনিত বা থ্রেটেন্ড গর্ভপাত

কোনো গর্ভবতী মহিলা যদি অভিযোগ করেন যে, হঠাৎ করেই তার যোনিপথ দিয়ে অল্প তাজা রক্ত যাচ্ছে, তলপেটে মাঝেমধ্যে ব্যথা হয় এবং পিভি (pervaginal) পরীক্ষা করে দেখা যায় জরায়ুর মুখ বন্ধ আছে, তখন তার এই শারীরিক হুমকির মুখে যে গর্ভপাত ঘটানো আবশ্যক হয়ে পড়ে তাকে থ্রেটেন্ড গর্ভপাত বলে। এক সপ্তাহ সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিলে সাধারণত গর্ভপাত থেকে মা রক্ষা পায় এবং পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে। অতএব গর্ভপাত ঘটানোর আগে এ সময়টুকু অপেক্ষা করে দেখা যেতে পারে।

অবশ্যই ঘটবে/ইনএভিটেবল গর্ভপাত (invevitable abortion)

এ-ক্ষেত্রে গর্ভবতী মহিলার যোনিপথ দিয়ে চাকা-চাকা এবং পরিমাণে প্রচুর তাজা রক্ত যাবে । সাথে তলপেটে প্রচণ্ড ব্যথা থাকবে এবং পরীক্ষা করলে দেখা যাবে জরায়ুর মুখ খোলা।

অসম্পূর্ণ গর্ভপাত (incomplete abortion)

গর্ভবতী মহিলার যোনিপথে যে-রক্ত নির্গত হবে তার সাথে দলাদলা কিছু জিনিষ, অনেক সময় বাচ্চার শরীরের কিছু অংশ, যোনিপথ দিয়ে বের হবে এবং পরীক্ষা করে বাচ্চার কিছু অংশ বা product of conception জরায়ুর মুখে দেখা যাবে। অনেক পুরনো হলে জরায়ুর মুখ বন্ধও থাকতে পারে।

লুক্কায়িত গর্ভপাত (missed abortion)

যদি জরায়ুর মধ্যে বাচ্চা (foetus) মরে গিয়ে এক সপ্তাহের বেশি থাকে এবং মা অভিযোগ করে যে, গর্ভকালীন উপসর্গ আগের মত দেখা যাচ্ছে না, সময়ের সাথে তলপেট উচু হচ্ছে না, তখনই ধারণা করতে হবে যে, জরায়ুর ভিতর ভ্রূণের মৃত্যু ঘটেছে অর্থাৎ রোগীর গর্ভপাত হয়েছে আগেই কিন্তু ক্লিনিক্যালভাবে প্রকাশ পায় নি। এ-ক্ষেত্রে ভ্রূণ জরায়ুর ভিতরেই থেকে যায়।

সংক্রামিত গর্ভপাত (septic abortion)

কোনো গর্ভপাত যদি জীবাণু সংক্রমণের কারণে জটিল অবস্থার সৃষ্টি করে তখন তাকে সেপটিক গর্ভপাত বলা হয়। এটি খুবই মারাত্মক। সাধারণত অবৈধভাবে যেসমস্ত গর্ভপাত ঘটানো হয় তাতে এটি বেশি হয়। আনাড়ি হাতে গ্রামাঞ্চলে অনেকে ১২-১৮ ইঞ্চি কাঠির মাথায় আর্সেনিক, কাঁচা পেপের রস, ধুতুরা-পাতা, অথবা লেড বা পেস্ট (যেগুলোকে এক-কথায় abortificient বা গর্ভপাত-উত্তেজক বলা হয়) দিয়ে জোরপূর্বক গর্ভপাত ঘটানোর চেষ্টা করে। এ-ক্ষেত্রে কোনো প্রকার পরিচ্ছন্নতা বা জীবাণুনাশক ব্যবস্থা (sterility) নেওয়া হয় না। এসব ক্ষেত্রে গর্ভপাতের পর দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব বের হয় এবং রোগীর প্রচণ্ড জ্বর আসে। তাপমাত্রা ১০১ ডিগ্রী ফারেনহাইট-এর নিচে নামতেই চায় না। রোগী কাঁপতে থাকে, বমি হয়, অনেক সময় তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে কমও থাকতে পারে। রোগী টক্সিন-আক্রান্ত অবস্থায় থাকে। জীবাণু রক্তে ছড়িয়ে গিয়ে অথবা গর্ভপাত ঘটাতে গিয়ে জরায়ু, এমনকী অন্ত্র ফুটো হয়েও অনেকে মারা যেতে পারে।

বৈধ/থেরাপিউটিক গর্ভপাত (medical termination of pregnancy)

ইচ্ছাকৃত গর্ভপাতের মধ্যে যেগুলোর জন্য সুনির্দিষ্ট কারণ থাকে–অর্থাৎ বাচ্চাকে বড় হতে দিলে সেটা বাচ্চা এবং মা দু'জনের জন্যই ক্ষতিকর হতে পারে, সেসব ক্ষেত্রে চিকিৎসকগণ গর্ভপাতের অনুমতি দেন। মা যদি রুবেলা ভাইরাসে আক্রান্ত হন তাহলে বাচ্চার চোখের ও হৃদপিণ্ডের মারাত্মক সমস্যা হতে পারে। এসব কারণে বাচ্চা যদি জন্মগত ত্রুটি নিয়ে জন্ম নেয় তবে তার পক্ষে পরবর্তী কালে বেঁচে থাকা দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। তাই গর্ভপাত ঘটানোই শ্রেয়।

অনেক সময় মাকে বাঁচাতে গর্ভপাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। এইচআইভি/এইডস, যক্ষা, হার্টের মারাত্মক সমস্যা, উচ্চ রক্তচাপ, জরায়ু কিংবা ব্রেষ্ট ক্যান্সার, ডায়াবেটিস এবং এর জন্য চোখের সমস্যা, মৃগীরোগ (epilepsy) এসব থাকলে গর্ভকালীন চাপ সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়ে এবং বাচ্চা ও মা কেউ সুস্থ হয় না। তাই গর্ভপাত ঘটানো হয়।

(গর্ভপাতের প্রতিরোধ, চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনা আগামী সংখ্যায় দেখুন)

এ-লেখায় ব্যবহৃত দু'টি ছবিই ইন্টারনেট থেকে নেওয়া

বাতজ্বর সম্পর্কে জ্ঞাতব্য

বাতজ্বর একটি মারাত্মক রোগ। এটি একটি ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের বিলম্বিত জটিলতা। 'স্ট্রেপটোকক্কাস বিটা হিমোলাইটিকাস গ্রুপ-এ' নামক একধরনের ব্যাকটেরিয়া দ্বারা গলায় প্রদাহ হওয়ার ৭-১০ দিন পর কারো কারো বাতজ্বর হতে পারে। তবে আশার কথা, এর সংখ্যা অতি নগণ্য।

যদিও বলা হয়ে থাকে: বাতজ্বর সাধারণত ৫-১৫ বছর বয়সের শিশু-কিশোরদের বেশি হতে দেখা যায়, তবু ক্ষেত্রবিশেষে বড়রাও এ-রোগে আক্রান্ত হতে পারে, যদিও এর সংখ্যা খুবই নগণ্য। পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের এ-রোগ হয় না বললেই চলে। সাধারণত দেখা যায়, যেসব শিশু অস্বাস্থ্যকর, স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশে বাস করে এবং "এক ঘরে অনেক লোক থাকে" এমন লোকদের এ-রোগ বেশি হয়। কোনো পরিবারের একজন শিশুর বাতজ্বর হলে ঐ পরিবারের অন্য শিশুরাও আক্রান্ত হতে পারে। বাতজ্বর হলে গিট, হৃদযন্ত্র এবং স্নায়ুতন্ত্রই বেশি আক্রান্ত হয়।

আমাদের দেশে শিশু-কিশোরদের হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রধান কারণই হলো বাতজ্বর। এ-রোগ জীবনে একাধিকবার হতে পারে। একবার এ-রোগ হলে বার বার হওয়ার আশঙ্কা থাকে। বাতজ্বরের কারণে হৃদযন্ত্রের ভাল্ব ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে অকেজো হতে পারে। পরিণামে রোগীর কর্মক্ষমতা কমে যায়, এমনকী অকাল মৃত্যুও হতে পারে। আমরা যদি সচেতন হয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলি তবে এ-রোগ প্রতিরোধ করা বা তার জটিলতা এড়ানো অনেকাংশে সম্ভব।

বাতজ্বর প্রতিরোধ করতে হলে বা তার জটিলতা এড়াতে হলে *যা যা করবেন*

১. আপনার শিশুর গলাব্যথা হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন
২. হাঁচি-কাশি দেবার সময় নাক-মুখ ঢেকে নেবেন এবং শিশুদেরও এ-অভ্যাস গড়ে তুলবেন।
৩. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে এবং আলো-বাতাস প্রবেশ করে এমন খোলামেলা ঘরে শিশুদের রাখবেন

যা যা করবেন না

১. এক ঘরে বেশি লোক ঘুমাবেন না
২. গলাব্যথাকে অবহেলা করবেন না; সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন
৩. চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া বাতজ্বরের অষুধ বন্ধ করবেন না

যা যা খাবেন

চিকিৎসকের পরামর্শমত ওষুধ খাওয়াবেন/খাবেন। যাদের একবার বা একাধিকবার বাতজ্বর হয়েছে তাদেরকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত পেনিসিলিন-ভি টেবলেট খেতে হতে পারে বা বেনজাথিন পেনিসিলিন ইনজেকশন আজীবন নিতে হতে পারে। তাছাড়াও, দাঁত-তোলা বা দাঁতের স্কেলিং-করা বা ছোটখাটো অপারেশন করাতে হলে অপারেশনের আগে থেকেই এন্টিবায়োটিক খাওয়া শুরু করা উচিত।

পুষ্টিকর সুষম খাবার খাওয়াবেন/খাবেন

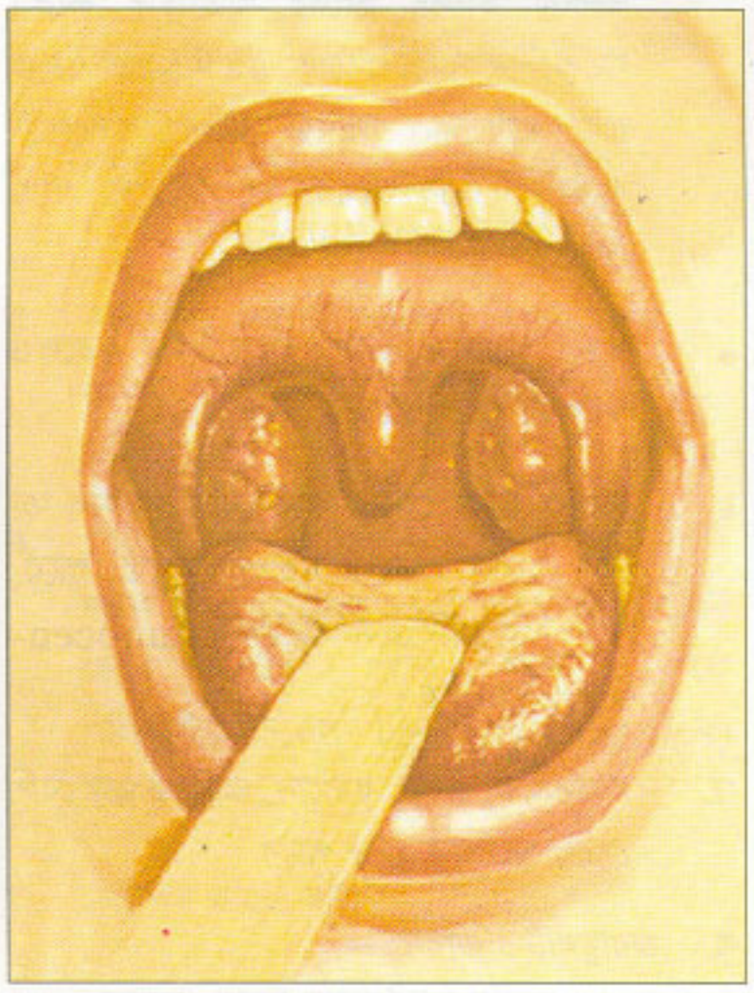

প্রাথমিক পর্যায়ে বাতজ্বরের জীবাণু রোগীর গলা ও টনসিল-কে সংক্রামিত করে

যা যা খাবেন না

১. আইসক্রীম
২. ফ্রিজে-রাখা ঠাণ্ডা পানি, ঠাণ্ডা পেপসি-কোক-স্প্রাইট, ইত্যাদি অতিরিক্ত ঠাণ্ডা অবস্থায় খাবেন না
৩. ফ্রিজে-রাখা ঠাণ্ডা খাবার (যেমন দই, মিষ্টি, পায়েস, ইত্যাদি) অতিরিক্ত ঠাণ্ডা অবস্থায় খাবেন না
৪. চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনো ওষুধ খাবেন না/খাওয়াবেন না

ডাঃ এম মতিউর রহমান
স্টাফ ক্লিনিক
আইসিডিডিআর,বি

স্বাস্থ্য সংলাপ-এর জন্য লেখা আহ্বান

আইসিডিডিআর,বি থেকে প্রকাশিত 'স্বাস্থ্য সংলাপ' নামের চতুর্মাসিক বাংলা ম্যাগাজিনে এখন থেকে কেন্দ্রের প্রাক্তন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পাঠানো লেখাও গুরুত্বের সঙ্গে ছাপানো হবে। সহ-লেখক হিসেবে অন্য যেকোনো লোকের নাম থাকলেও প্রকাশনার জন্য লেখা গ্রহণ করা হবে। এই ম্যাগাজিনের সম্পাদনা পরিষদের এক বর্ধিত সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। চিকিৎসা, প্রতিকার ও প্রতিরোধের উপায়সহ বিভিন্ন স্বাস্থ্যসমস্যার ওপর তদানীন্তন কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরি কিংবা আইডিডিআর,বি'র প্রাক্তন চিকিৎসক এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাছ থেকে লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে। বর্তমানে স্বাস্থ্য সংলাপ-এর ৬০,০০০ কপি বাংলাদেশের নানাস্থানে কর্মরত ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী, এনজিও-কর্মী, পল্লী-চিকিৎসক এবং তালিকাভুক্ত অন্যান্য শ্রেণীর পাঠকদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। অতএব আপনার লেখা বৃহত্তর পাঠক সমাজের কাছে পৌছাবার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম স্বাস্থ্য সংলাপ। এই সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে নিচের ঠিকানায় লেখা পাঠান:

এম. শামসুল ইসলাম খান, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, স্বাস্থ্য সংলাপ, আইসিডিডিআর,বি, মহাখালি, ঢাকা ১২১২ অথবা জিপিও বক্স ১২৮, রমনা, ঢাকা ১০০০